বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় নারী
সমস্যা ও সম্ভাবনা

ইমরানা হক

সাংবাদিকতা বরাবরই চ্যালেঞ্জিং পেশা হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন এই পেশায় নারীদের অংশগ্রহণ প্রায় দেখা যেত না। শিক্ষকতা, আইনি ও চিকিৎসা সেবাদান, অফিসের অভ্যর্থনা কেন্দ্র প্রভৃতি ক্ষেত্রেই কেবল নারীদের পেশাগত অংশগ্রহণ সীমাবদ্ধ ছিল। গতানুগতিক এসব পেশার বাইরে চ্যালেঞ্জিং পেশাগুলোতে আমাদের দেশের নারীদের অংশগ্রহণ বেশ দেরিতে শুরু হয়। বর্তমান সময়ে বিমান-রেলগাড়ি ও ভারী যানবাহন চালনা থেকে শুরু করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন, ইমারত নির্মাণে নেতৃত্বদান, নির্বাহী হিসেবে বড়ো বড়ো অফিস পরিচালনা, মন্ত্রণালয় পরিচালনার মতো চ্যালেঞ্জিং পেশায়ও নারীদের দেখা যায়। একইভাবে সাংবাদিকতা পেশায়ও আজকাল নারীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, অনলাইন সকল মাধ্যমেই তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। টেলিভিশন সাংবাদিকতার ব্যাপকতা শুরু হবার পর নারীদের অংশগ্রহণ এক্ষেত্রে অনেক বেশি দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটেই আমরা দেখতে চেয়েছি, বর্তমান বাংলাদেশে, গণমাধ্যমের ব্যাপক জোয়ারের সময়ে, নারী সাংবাদিকরা কতটা স্বচ্ছন্দে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারছেন। বিষয়টা খতিয়ে দেখতে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের একজন ইন্টার্ন হিসেবে আমি কয়েকটি গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কথা বলেছি। সম্মানিত সাক্ষাৎকারদাতাগণের দেয়া তথ্যের ওপরে ভিত্তি করেই এই প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে এবং অতি অবশ্যই বাংলাদেশে সাংবাদিকতা পেশা যেহেতু সামাজিক সম্মান ও মর্যাদার বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেহেতু নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেকের মধ্যেই এখন এই পেশা অবলম্বনের আগ্রহ লক্ষ করা যায়। সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সনদ থাকা বাধ্যতামূলক নয়। কেউ চাইলে অন্য বিষয়ে পড়াশোনা করেও সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নিতে পারেন। এমন অনেকেই বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় অবস্থান ও সম্মানের দিক থেকে উঁচুস্থানে আছেন। পাশাপাশি অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা সাংবাদিকতা পেশায় আসবার আগে এ বিষয়ক বিশেষায়িত শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, দেশে দু'ধরনের নারী-পুরুষই সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন ও নিচ্ছেন, যাঁদের একাংশ গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা করেছেন ও যাঁরা করেন নি। একটা সময় ছিল, যখন চাইলেই সাংবাদিকতা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নেয়া যেত না, কারণ দেশে এ বিষয়ে পড়াশোনা করবার সুযোগ ছিল না। বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই এ বিষয়ে উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই সবার প্রথমে ১৯৬২ সালে সাংবাদিকতা বিভাগ খোলা হয়, যদিও তখন এটি ছিল ডিপে- ামা কোর্সের অধীনে। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৭ সালে স্নাতক বিভাগ খোলা হয় এবং পরের বছর খোলা হয় স্নাতকোত্তর বিভাগ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগ চালু হয় ১৯৯৩ সালে, আর চট্টগ্রাম বিশ্বদ্যিালয়ে ১৯৯৪-৯৫-এ।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ইনডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপেন্ট অল্টারনেটিভ, স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকান ইন্টান্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ প্রভৃতিতে সাংবাদিকতা কোর্স চালু রয়েছে।

দেশে এখন দৈনিক-সাপ্তাহিক-পাক্ষিক মিলিয়ে পত্রিকার সংখ্যা অনেক, যে সংখ্যা এখনো ক্রমবর্ধমান। এর মধ্যেই অনেক টিভি চ্যানেল এসেছে, বেড়েছে রেডিওর সংখ্যাও। ফলে এখানে সাংবাদিকতা পেশা অবলম্বনের ক্ষেত্র অনেকটাই প্রসারিত হয়েছে ও হচ্ছে। চাকুরির সুযোগ বাড়ায় বেশি সংখ্যক নারীর এ পেশায় যোগদানের সুযোগও বেড়েছে। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ও এ ধরনের বিষয়গুলোর জনপ্রিয়তাও বেড়েছে। এমন নয় যে, সাংবাদিকতা বিষয়ে পড়াশোনা করলে বাধ্যতামূলকভাবে কেবল সাংবাদিকতাই করতে হবে, অন্য যেকোনো পেশায় যাওয়ার সুযোগও তাদের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত থাকে; যেমন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আধুনিক ব্যাংক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাবলিক রিলেশনস বিভাগগুলোতে সাংবাদিকতায় পড়াশোনা করা ছেলেমেয়েদের কদর রয়েছে। এ বিষয়ে দৈনিক সমকালের গুরুত্বপূর্ণ সিনিয়র সাংবাদিক অজয় দাশগুপ্ত যথার্থই বলেছেন যে, বর্তমানে দেশে পত্রিকা রয়েছে ২০০-রও বেশি। টিভি চ্যানেল ২০টির মতো, বেতারকেন্দ্র ৮-১০টি। এছাড়া কমিউনিটি বেতার কেন্দ্র চালু হওয়া, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পিআর সেকশন সৃষ্টি এবং ব্যাংকিং ও অন্যান্য ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউটশন বাড়তে থাকায় সাংবাদিকতা বিষয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের উপযোগী নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে দেশে।

বর্তমান পৃথিবী তথ্যের ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। বর্তমান যুগ অবাধ তথ্যপ্রবাহের যুগ। তথ্যের আদানপ্রদানের মাধ্যমে বর্তমানে জাতি, দেশ, কাল এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটছে, আর বিভিন্ন ঘটনার সংবাদ মানুষ জানতে পারছে সংবাদকর্মীদের মাধ্যমে। অর্থাৎ সাংবাদিকতার মাধ্যমে সাংবাদিকরা এই খবরগুলো সবার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে, সাংবাদিকতা পেশাটি চ্যালেঞ্জিং। কারণ এতে নানারকম ঝুঁকি রয়েছে, রয়েছে ঘাত-প্রতিঘাত। এসব সত্ত্বেও এ পেশার প্রতি নারী-পুরুষের সহজাত আকর্ষণের কারণে বর্তমানে সমাজে সাংবাদিকতা পেশার চাহিদাও বেড়েছে। এই পেশার মাধ্যমে যেহেতু সাধারণ মানুষের কাছাকাছি যাওয়া যায় এবং তাদের সমর্থন পাওয়া যায়, সমাজের বিভিন্ন ধরনের সমস্যাগুলো বের হয়ে আসে, তাই বর্তমানে অনেক নারী-পুরুষই এই চ্যালেঞ্জটিকে গ্রহণ করতে চাইছে। তাছাড়া সাংবাদিকতা এখন একটি সম্মানজনক পেশাও। অন্যান্য কিছু পেশার মতো এ পেশাও সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়ে দিচ্ছে। যে কারণে এ পেশা অবলম্বনের প্রতি আগে যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তা-ও এখন নেই বললেই চলে। এমনকি নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও সামাজিক বাধা প্রশমিত হয়েছে। যে কারণে অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ পেশার মতো এ পেশাকেও যথাযথ গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে।

এসব কারণে এখন নারীরা অনেক বেশি সংখ্যায় এ পেশায় যোগদান করছেন। টিভি চ্যানেলের সংখ্যা বাড়ায় এই পেশার কর্মক্ষেত্র যেমন বেড়েছে, তেমনি নারীদের এই পেশায় যোগদানের ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিও আগের চেয়ে বদলেছে। এ ব্যাপারে বৈশাখী টেলিভিশনের সিইও মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল জানান, বর্তমানে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। মেয়েরাও এই বিষয়টাকে ওভারকাম করেছে এবং আমাদের মধ্যে যে অস্বস্তিবোধ ছিল তা চলে গেছে। এখন একজন নারীকে এত কিছু ভাবতে হয় না। সে সহজেই চলে যেতে পারছে অ্যাসাইনমেন্ট কাভার করার জন্য পুরুষ রিপোর্টার বা সহকর্মীর সাথে। অর্থাৎ মেয়েদের মানসিকতা যেমন বদলেছে, তেমনি বদলেছে পুরুষ সহকর্মী, দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও সমাজ সদস্যদের। যে নারী সাংবাদিকতা করছে, তার পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন এসেছে, যে কারণে নারী সাংবাদিকদের সংখ্যা এখন অনেক বাড়ছে।

অবশ্য গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক রোবায়েত ফেরদৌসের কথায় একটি অন্য চিত্রও উঠে এসেছে। তিনি মনে করেন, শিক্ষিত পরিবারগুলো তাদের মেয়েদের হয়ত পড়ালেখা করাচ্ছে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সবসময় এরকম থাকে না যে, মেয়েটা স্বাবলম্বী হবে ও ঝুঁকিপূর্ণ চ্যালেঞ্জিং পেশা গ্রহণ করবে। তারা মনে করে যে মেয়েকে পড়াশোনা করাচ্ছি, একটা ভালো জায়গায় বিয়ে দেয়া যাবে। বিয়ে করানোর জন্য অন্য পরিবারের শিক্ষিত মেয়ে দরকার, দুঃখজনকভাবে এই জায়গাটা এখনো রয়ে গেছে। বেশি হলে তারা চায়, তাদের মেয়েরা স্কুল টিচার বা কলেজ টিচার এই জাতীয় চাকরি করবে, যেটা হবে সফট বিট-এর মতো সফট পেশা। অর্থাৎ সমাজের যে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, সেটা থেকে মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন মুক্ত নয়, তেমনি আমাদের পরিবারগুলোও মুক্ত নয়। অনেক পরিবারেই কিন্তু এই ব্যাপারগুলো রয়ে গেছে যে সাংবাদিকতা বিষয়ে পড়ছো ঠিক আছে, কিন্তু সেটাকে পেশা হিসেবে নেয়া যাবে না।

গণমাধ্যমগুলোতে নারী সাংবাদিকদের নিয়োগের ব্যাপারটিকে বর্তমানে কীভাবে দেখা হয়, সে ব্যাপারে নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের প্রেসিডেন্ট নাসিমুন আরা হক মিনু বলেন, প্রিন্ট মিডিয়া কর্তৃপক্ষের নারী সাংবাদিক নেয়ার মানসিকতা থাকে না। তারা ভাবে, রাতের শিফটে মেয়েরা কাজ করতে পারবে না, মেয়েদের বাইরে রিপোর্টিংয়ে পাঠানো যাবে না, সন্ধ্যার মধ্যে বাসায় ফিরতে হবে, রিপোর্টিংয়ে পাঠালে তার কোনো বিপদ হতে পারে। কর্তৃপক্ষের এই ভাবনাটা কমবেশি এখনো রয়ে

গেছে। আগে যদিও এ বিষয়গুলো অনেক বেশি ভাবা হতো। যে নারীটি খুব দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে কাজ করছে, গুরুত্বপূর্ণ কঠিন কাজ করছে নিষ্ঠার সাথে, তাদের ক্ষেত্রে ভাবা হতো, 'ও তো মেয়ে! ওর চাকরির কী দরকার!' ইত্যাদি। তবে বর্তমানে এই জিনিসটা কিছুটা বদলেছে।

সব মিলিয়ে বর্তমানে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া তথা টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও বেতারে নারীকর্মী নিয়োগের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। নারী সাংবাদিকরা এখন অনেক দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে কাজ করছেন। কারণ নিয়োগকর্তা ও পরিবারের মানসিকতা অনেকখানি বদলেছে। নারী সাংবাদিকদের কাজের প্রতি তাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে।

সাংবাদিকতা পেশায় নারীর সংখ্যা বাড়লেও কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ অনেক ক্ষেত্রে এখনো সর্বক্ষেত্রে ইতিবাচক নয়। কাজ করতে গিয়ে নারী সাংবাদিকদের নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এর মধ্যে পুরুষ সহকর্মীদের কাছ থেকে নানা ধরনের অসহযোগিতা ছাড়াও আছে বিভিন্ন কটূ মন্তব্য ও নানারকম হয়রানি।

মিডিয়ায় নারীদের কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হয়রানির ব্যাপারে মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল বলেন, প্রযুক্তির উন্নতিতে এ ধরনের হয়রানি করা সহজ হচ্ছে। একবার প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র একজন লোক আমাদের এক নারী কলিগকে মোবাইলে আজেবাজে এসএমএস করেন। এতে মেয়েটি হতবাক হয়ে যায় ও অনেক কান্নাকাটি করে। পরে সে এসে ব্যাপারটি আমাকে বললে আমি মিটিংয়ে এ নিয়ে কথা বলি। উত্যক্তকারীর নাম উল্লেখ না-করে আমি মিটিংয়ে বলি যে, এখানে আমরা নারী-পুরুষ সহককর্মীরা সবাই একসাথে কাজ করি। কিন্তু কারো আচরণের কারণে যদি কোনো সহকর্মী অপদস্থ হয়, কেউ চাকরি ছেড়ে চলে যায়, তাহলে সেটা হবে দুঃখজনক। পরে সেই লোকটি নারী সহকর্মীর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হন। এ ধরনের ঘটনা পরে আর ঘটে নি। পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় মেয়েদের এ ব্যাপারগুলো নিয়ে মুখ খুলতে হয়। অর্থাৎ মেয়েদেরও এক ধরনের পুরুষালি আচরণ শিখতে হয় প্রতিবাদ করার জন্য।

নাসিমুন হক আরা মিনু এ ব্যাপারে বলেন, একটা নারী যখন কাজ করে তখন চারপাশ থেকে তাকে নানা ধরনের মন্তব্য শুনতে হয়। একটা কাজ নারী যে খুব সহজভাবে করতে পারে তা কিন্তু নয়। তার অ্যাসাইনমেন্ট পাওয়া কঠিন হয়। অ্যাসাইনমেন্ট পাওয়ার পর সেটার মূল্যায়ন সবসময় সঠিক হয় না, নিউজ ট্রিটমেন্ট ভালো করা হয় না। নিউজ অন্যরকম করে দেয়। ফার্স্ট পেজে যেটার জায়গা পাওয়া উচিত, সেটা লাস্ট পেজে থাকে। লিড হলে বলা হয়, 'তোমার তো এডিটরের সাথে খাতির আছে! তাই তোমারটা লিড নিউজ হয়েছে।' এগুলো কিন্তু এখনো আছে। মেয়েদের এখনো অনেক কিছু শুনতে হয়, যা খুব সুখকর নয়। এটাই বাস্তবতা। এই ছোটো ছোটো বিষয় ছাড়াও আরো অনেক রকম হয়রানি আছে। সঠিক মূল্যায়ন করা হয় না। দেখা যায় একজন যোগ্য নারীকে রেখে হয়ত কম যোগ্য একজন পুরুষকে প্রমোশন দেয়া হয়। ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে বা বিদেশে দেখা যায় পুরুষ সাংবাদিককেই পাঠানো হয়, নারীকে নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাটা কাজ করে। অনেক সময় অসচেতনভাবেও তারা এ ধরনের আচরণ করে থাকে। প্রগতিশীলতার কথা বললেও তাদের মধ্যে আসলে অনেক ক্ষেত্রে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে।

নারী সাংবাদিকদের হয়রানি শিকার বা অসহযোগিতার মোকাবেলা করতে হওয়া প্রসঙ্গে রোবায়েত ফেরদৌস বলেন, আমি প্রথম আলোর কথা বলছি এজন্য যে, তারা দাবি করে, তারা খুব জেন্ডার সেনসেটিভ, তারা নারীদের নিয়ে কাজ করে। কিন্তু সেখানেও এমন অনেক নারী ছিলেন, যারা কাজ করতে গিয়ে আর টিকতে পারে নি। তাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি এবং তাদের লেখাও আমি আমার বইতে ছেপেছি। তারা যে বর্ণনা দিয়েছে, সেটা কিন্তু খুব ইতিবাচক নয়। তারা বলেছে যে, তাদের পুরুষ সহকর্মীরা ঠিকমতো সহযোগিতা করে নি এবং সম্পাদকের দিক থেকেও তারা ইতিবাচক দ ৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পায় নি। একজন নারী সহকর্মীকে সম্পাদক বলেছেন যে, 'পুরুষরা তো মোটর সাইকেল চালাতে পারে, আপনি কি পারবেন?' এটা কোনো প্রশ্ন হতে পারে না। তাকে দিয়ে দেখলেই দেখা যেত যে সে চালাতে পারে। আজকাল অনেক মেয়েই মোটরবাইক চালাচ্ছে। দুই পা দুদিক দিয়ে মোটর সাইকেলে নারী বসবে, এটা সম্পাদকের ভালো লাগে না। তার মানে, সম্পাদকের ভেতরে আসলে একটা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা রয়ে গেছে। আর যারা পুরুষ সহকর্মী তারাও অনেক সময় সহযোগিতা করে না। এছাড়া ওখানে একটা কমন কথা আছে, একজন নারী যদি খুব ভালোভাবে রিপোর্ট বের করে আনতে পারে, তাহলে বলা হয়, 'ও! তুমি নারী দেখেই নানাভাবে ম্যানেজ করেছো।' আর না-পারলে তো বলাই হয়, 'তুমি তো মেয়ে! তুমি পারবাই না।' পেশাগত কাজে একজন নারীর নানাভাবে টিজিংয়ের শিকার হতে হয়। এক্ষেত্রে নারীদের দ্বিমুখী চাপে পড়তে হয়।

এটা উল্লেখযোগ্য যে, সাংবাদিকতা পেশায় নারীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়লেও নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে তাদের সংখ্যা এখনো ঢের কম। উচ্চ বা নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে পৌছানোর জন্য যে ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়, সেটা

নারীরা পায় না বলেই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক নারী সে জায়গায় পৌঁছুতে পারে না। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে অনেকেই এখনো নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে নারীদের উপস্থিতিকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারেন না।

এ ব্যাপারে নাসিমুন আরা হক মিনু বলেন, মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোতে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের বেশির ভাগই পুরুষ। ফলে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে মেয়েদের দেখা যায় খুব কম। সাংবাদিকতায় তাঁদের সংখ্যাটা কিছুটা বাড়লেও নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে তাঁরা যেতে পারছেন না। সম্পাদক পদে হাতে গোনা ২/১ জন আছেন। বর্তমানে যুগান্তরের এডিটর একজন নারী, অনন্যার এডিটর তাসমিমা হোসেন; এঁরা মালিক হিসেবে সম্পাদক। অর্থাৎ যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁরা যেতে পারছেন। কিন্তু যাঁরা যোগ্যতাবলে উচ্চপদে আছেন, তাঁরা হলেন ডেইলি স্টার ম্যাগাজিনের এডিটর আশা মেহরীন আমিন, প্রথম আলোর ফিচার এডিটর সুমন শারমীন আর এটিএন নিউজের মুন্নী সাহা। এছাড়া পত্রিকায় শিফট ইন চার্জ-এর দায়িত্বও খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে হয়ত ৫/৬ জন আছেন। প্রথমে আমরা ছিলাম, জনকণ্ঠে আমরা দায়িত্ব পালন করেছি। আমি সংবাদ পত্রিকায় এডিটোরিয়াল বিভাগের প্রধান ছিলাম। এখন আমি চারবেলা চারদিক ও বেঙ্গল বার্তা— এই দুটো মাসিক পত্রিকার এডিটর হিসেবে কাজ করছি। বলতে চাচ্ছি, নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে নারীদের সংখ্যা কম। এ পর্যায়ে নারীদের যেতে হবে, তা না-হলে নারীদের অনুকূলে সংবাদ আসবে না, নারীদের সম্পর্কে নিউজের ট্রিটমেন্ট ভালো হবে না, ফোকাস থাকবে না এবং নারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুকূল মনোভাব তৈরি হবে না।

সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এ পেশায় দেশ-বিদেশের অ্যাসাইনমেন্ট, বেতন, সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এখনো লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের বিষয়টি রয়ে গেছে। ভালো অ্যাসাইনমেন্ট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারীর চেয়ে একজন পুরুষই প্রাধান্য পান। সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও পুরুষরাই অগ্রাধিকার পান। রেডিও টুডেতে কর্মরত সাংবাদিক ফারাহ তানজির মতে, কোনো স্পেশাল ডেতে সবাই চায় স্পেশাল প্রোগ্রামগুলো কাভার করতে, যেমন এটা আন্তর্জাতিক নারী দিবস হতে পারে। এখানে একটা ব্যাপার আমি উল্লেখ করতে চাই, সেটা হচ্ছে, নারী দিবসের রিপোর্টগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েদের দিয়েই কাভার করানো হয়। এটা কিন্তু ইচ্ছা করলে একটা ছেলেও কাভার করতে পারে। আমি বলব, এখানে একটা সূক্ষ্ম জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন হয়। একটা ছেলে কি নারী দিবস নিয়ে খুব সুন্দর একটা প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে না? অবশ্যই পারে। এছাড়া আরেকটা যেটা হয় যে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিন, যেমন পহেলা বৈশাখ, এখনকার হালের ক্রেজ ভ্যালেন্টাইনস ডে, এই প্রোগ্রামগুলো কাভার করতে পাঠানো হয় ছেলেদের। কিন্তু কেন? একটা মেয়ে কি এক্ষেত্রে ভালো একটা রিপোর্ট তৈরিতে অক্ষম? অবশ্যই নয়। কিন্তু তা তাদের করতে দেয়া হয় না। আমার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, হয়ত এমন একটা নিউজ কাভার করতে পাঠিয়েছে, যেটার সেরকম কোনো নিউজ ভ্যালু নেই। ওখানে আমার নিজের যে যোগ্যতা, দক্ষতা সেটা দেখানোর কোনো সুযোগ নেই। নিজেকে প্রমাণ করার আমার কোনো অপশন নেই। কিন্তু একটা ছেলেকে দেখা যাচ্ছে, ভালো ভালো অ্যাসাইনমেন্ট পাচ্ছে, ভালো ভালো বিট কাভার করছে। ভালো বিট বলতে সেটা পিএম হতে পারে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে পারে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে পারে। এগুলোর ক্ষেত্রে যদি লক্ষ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব বিট পুরুষরা কাভার করছে। নারীরা যে একদমই নেই তা নয়, তবে খুব কম ও পুরুষদের অধীনে। নারীরা তাদের অনুগত হয়ে কাজ করছে। ফলে বৈষম্যের ব্যাপারটি আসলে রয়েই গেছে।

তবে বর্তমানে পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। সীমিত পর্যায়ে নারীরা যোগ্যতার ভিত্তিতে ভালো ভালো অ্যাসাইনমেন্ট যেমন পাচ্ছে, তেমনি পাচ্ছে বেতন, সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি। এরকম স্বর প্রক্ষেপিত হলো দেশ টিভির সাংবাদিক ফারজানা রূপার কণ্ঠে। তিনি বলেন, যে মেয়েটা আসলে পারবে বলে বসরা মনে করেন, তাকে দিন শেষে তাঁরা কিন্তু আটকান না। কারণ দিন শেষে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো, অন্যান্য চ্যানেলের সাথে প্রতিযোগিতা করে সবচেয়ে ভালো রিপোর্ট প্রচার করে টেক্কা দেয়া। আমি আমার কিছু সহকর্মীর ক্ষেত্রে দেখেছি, গর্ভবতী হবার পর তাদের ডেস্কে চলে যেতে হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা এমন নয় যে, তাদের জোরপূর্বক ডেস্কে পাঠানো হয়েছে। যোগ্যতার ভিত্তিতে এখানে নারী-পুরুষ সবাই কাজ করছে। ফলে বৈষম্য আসলে কম।

কোনো পেশাই শুধু পুরুষের বা শুধু নারীর জন্য নয়। কারণ পুরুষের মেধা ও নারীর মেধা সমান। নারী হয়েছে বলেই সে দুর্বল, অধস্তন, তার পক্ষে সাংবাদিকতার মতো চ্যালেঞ্জিং পেশায় কাজ করা সম্ভব নয়, এই ধরনের জেন্ডার ছাঁচিকরণ ঠিক নয়। এ ধরনের মানসিকতা কাজ করলে নারীদের প্রতি বৈষম্য করা হয়। পৃথিবীতে যেকোনো কঠিন ও ভালো কাজ আসলে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় করা সম্ভব হচ্ছে এবং হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় যেমনটি বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'। আদতেই ব্যাপারটা তাই।

সাংবাদিকতাসহ যেকোনো পেশার ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। সাংবাদিকতায় এখন নারীরা দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে কাজ করছেন। সাংবাদিকতা পেশায় যে নারীরা ভালো করতে পারেন, তা মুন্নী সাহা, কিশোয়ার লায়লা, ফারজানা রূপা, সুমনা শারমীন, আশা মেহরীন আমিন প্রমুখ নারীদের কাজ দেখলেই বোঝা যায়। যেসব নারী এই সেক্টরে কাজ করছেন তাঁরা যথেষ্ট নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সাথে তাঁদের কর্ম সম্পাদন করছেন ও সফলতা অর্জন করছেন। যুদ্ধের খবর কভার করতে মুন্নী সাহার মতো নারী সাংবাদিক স্বয়ং লিবিয়ায় চলে যাচ্ছেন, সুমনা শারমীন প্রথম আলোর মতো প্রথম সারির পত্রিকার ফিচার এডিটরের দায়িত্ব পালন করছেন যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে। সুতরাং নারীরা পারেন না, এ ধরনের কিছু আসলে নেই। নারীরা পুরুষের মতো সব কাজই সমান যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে করে দেখাতে পারেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বর্তমানে এই কথা আরো বেশি প্রযোজ্য। নারীরা এই পেশায় সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিচ্ছেন শত বাধা থাকলেও কাজের যোগ্যতায়, কাজে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

যদিও এখন নারীরা সাংবাদিকতা পেশায় সাফল্যের সাথে কাজ করছেন এবং তাঁদের সংখ্যাটাও এখন অনেক বেশি, তারপরও কাজ করতে গিয়ে তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠানের পুরুষ সহকর্মীদের দ্বারা। অর্থাৎ নানা ধরনের হয়রানি, কটূ কথা, বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য, কাজে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অসহযোগিতা এখনো রয়ে গেছে। এসব সমস্যার সমাধানে সাক্ষাৎকারপ্রদানকারী অভিজ্ঞ সাংবাদিকগণ যে ধরনের প্রস্তাব করেন, সেগুলো হলো—

- মিডিয়া কর্তৃপক্ষের পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে।
- নারীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রমোশন দিতে হবে।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অধিক সংখ্যায় নিয়োগ দিতে হবে।
- নারীদের জন্য যথাযথ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
- নারী-পুরুষ সবাইকে সমানভাবে দেখার মানসিকতা থাকতে হবে।
- নারীদের জন্য পর্যাপ্ত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, যেমন পরিবহণ সুবিধা, কাজের ক্ষেত্রে সব ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- নারী বলে দমিয়ে রাখা যাবে না, যোগ্যতার ভিত্তিতে কাজের সুযোগ দিতে হবে।
- নারী সহকর্মীদের প্রতি পুরুষ সহকর্মীদের আচরণ ও মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে।
- নারীদের প্রতি কোনো ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটলে সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।
- অসহযোগিতা ও হয়রানি বন্ধে মিডিয়া পলিসি থাকতে হবে।
- কাজের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সবার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।
- সাংবাদিকতায় নারীদের নিয়োগের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
- নারীদের কাজের সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে।
- পরিবার ও সমাজের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা বদলাতে হবে।
- পরিবার ও সমাজ থেকে নারীদের এই পেশায় আসার ক্ষেত্রে উৎসাহ দিতে হবে।
- নারীদের নিজেদের কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে।

এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে আশা করা যায় নারীরা সাংবাদিকতা পেশায় আসবার ব্যাপারে আরো বেশি আগ্রহ বোধ করবেন।

ইমরানা হক শিক্ষার্থী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। toma.mcj.du@gmail.com

সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ

"সমাজে এরকম একটা স্টেরিওটাইপিং তৈরি হয়ে গিয়েছে যে, মিডিয়ায় কাজ করা নারী মানেই খারাপ। এই ধারণাটা এখনো রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে আমি আমার ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাই। আমার খুব ভালো একজন বন্ধু ছিল, যে শিক্ষিত পরিবারের ছেলে। কোনো একদিন অ্যাসাইনমেন্ট কাভার করে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। তখন আমার অফিসেরই এক বড়ো আপু আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যান। যদিও অ্যাসাইনমেন্ট কাভার করতে যেখানে গিয়েছিলাম, সে জায়গাটা আমার বাসা থেকে কাছেই ছিল। রাতে সেই বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার সময় আমি বলি যে, এক সিনিয়র আপু আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়েছেন। বাসায় আমাকে একা ফিরতে হয় নি। তখন যে মন্তব্যটি সে করেছিল, সেটি হচ্ছে, রাত ১১টায় বাসায় ফিরলে শুধু আপু কেন, পৌঁছে দেয়ার জন্য ভাইয়ারও অভাব হবে না। এখানেই আমার প্রশ্ন যে, একটা শিক্ষিত সংস্কৃতিমনা ছেলে যদি এই ধরনের মানসিকতার অধিকারী হয়, তার মনেই যদি এই ধারণা হয়, তাহলে যারা কম শিক্ষিত তারা এক্ষেত্রে কী ধরনের মনোভাব পোষণ করে থাকে! এই জিনিসগুলো থেকে মেয়েদের নিজেদেরই সতর্ক থাকতে হবে। যেসব পুরুষ সহকর্মীর আচরণ অন্যরকম, তাদের আচরণ নিজেদেরই সংশোধন করিয়ে নিতে হবে। তাদের মধ্যে ন্যায়নীতি, আদর্শবোধ জাগ্রত করতে হবে। নারী সহকর্মীদের নারী হিসেবে না-দেখে, সহকর্মী হিসেবে ভাবতে শিখাতে হবে।

একটা সময় যখন বাইরে কাজ করতাম, তখন কিছু সমস্যা হতো। একটা মেয়ে যখন অ্যাসাইনমেন্ট কাভার করতে যায়, তখন পুরুষ সহকর্মীরা যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, সাহায্য-সহযোগিতার ভাব দেখায়। তবে আমি যেখানে আছি, সেখানে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে এই ব্যাপারগুলো অনেক কম ফেস করতে হচ্ছে। একজন মেয়ে সহকর্মী হিসেবে পুরুষ সহকর্মীর কাছ থেকে বিব্রত হওয়া বা কাজের জায়গায় বৈষম্য, বিরক্ত করা, কমেন্টস করা, অশুভ ও অপ্রীতিকর ইঙ্গিত দেয়া, এই জিনিসগুলো এখানে অনেক কম। কিন্তু আমার অনেক বান্ধবী যারা অন্য বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে, তাদের কাছ থেকে যেটা শুনতে হয় সেটা হচ্ছে, মেয়ে বলে তাদের অ্যাসাইনমেন্ট দেয়ার সময় অনেক ভেবেচিন্তে দেয়া হয়। ভালো করতে পারবে জেনেও ঝুঁকির কারণে সেটা করতে দেয়া হয় না। মনে করা হয়, যেসব কাজে চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি আছে, সেসব কাজ ছেলেরাই ভালো পারবে। অর্থাৎ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মেয়েরা তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে না কেবল সুযোগের অভাবে। আর যেটা হয়, সেটা হচ্ছে অফিস এনভায়রনমেন্ট সবার জন্য সবসময় অনুকূলে থাকে না। দেখা যায় যে, চাকুরিতে উন্নতির প্রয়োজন দেখিয়ে সরাসরি না-হলেও আকারে ইঙ্গিতে পরোক্ষভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন আসে। কিন্তু আমি ব্যক্তিগভাবে কখনোই এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হই নি। কিন্তু অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, এরকমটা হয়ে থাকে।

পুরুষ সহকর্মীদের অধিকাংশের আচরণই বন্ধুত্বপুর্ণ। কিন্তু তারপরও কিছু ব্যতিক্রম তো থেকেই যায়। ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভের চেষ্টা অনেক সময় থাকে। অনেকের ধারণা থাকে যে, মিডিয়ায় যেসব নারী কাজ করে তারা অনেক বেশি উচ্ছৃঙ্খল, খোলামেলা। তাদের সাথে যে কেউ ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে পারে। কিন্তু আসলে যে তা না সে ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে মেয়েদের নিজেদেরই উদ্যোগী হতে হবে। বিকৃত মানসিকতার লোকদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে সবার সামনে।"

—তাসনিম নূরীন, এবিসি রেডিও

"পেশা হিসেবে সাংবাদিকতাকে অর্থনৈতিকভাবে যতটা উচ্চ স্তরের বলে দেখা হয়, সামাজিক মর্যাদায় তার থেকে এটি অনেক উচ্চ অবস্থানে পৌঁছে গেছে বলা যায়।

একদিনে বিপ- ব করে বা আন্দোলন করে বলা যাবে না যে, আজ থেকে আমরা নারী-পুরুষ সমান সমান। আমি এই মতবাদে বিশ্বাসী নই। বহু বছরের চেষ্টায় বর্তমানে তাদের একটা অবস্থান তৈরি হয়েছে। নতুন মানসিকতায় ফিরে আসতেও আমাদের আরো সময় লাগবে। সাংবাদিকতা পেশায় বর্তমানে অনেক মেয়ে আসছে। তবে কাজের গুণগত মানের দিক থেকে দেখলে সংখ্যাটা খুব বেড়েছে বলা যাবে না। পত্রিকার সম্পাদক, চ্যানেলের প্রধান পদে নারীর সংখ্যা অনেক কম। অর্থাৎ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীরা নেই বললেই চলে। এই জায়গাটাতে এখনো গ্যাপ রয়ে গেছে। এজন্য মূলত ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দায়ী হলেও কিছুটা দায় কত ৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিরও। যোগ্যতা থাকলেও নারীদের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব দেয়া হয় না। যেমন প্রিন্ট মিডিয়ায় দেখা যায়, স্বাস্থ্য, নারীপাতা, এই জায়গাগুলো কাভার করানো হয় নারীদের দিয়ে। কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় দেখা যায়, এই জায়গাটা নারীরা ভাঙতে পেরেছেন। আমি সচিবালয় বিট করি, যেখানে অন্য চ্যানেলের নারী সাংবাদিকও আছেন কয়েকজন। এই চ্যালেঞ্জের জায়গাটা কিন্তু রয়ে গেছে। তারপরও মেয়েরা কাজ দিয়ে প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, সব কাজই তারা করতে পারেন।

আমি পরিবারের ছোটো মেয়ে। আমি আমার পরিবার থেকে এ পেশার সঙ্গে যুক্ততার ক্ষেত্রে কোনো বাধার সম্মুখীন হই নি। তারপর আমি বৈবাহিক সম্পর্কে গিয়েছি। আমার স্বামীর কাছ থেকেও আমি এক্ষেত্রে কোনো বাধা পাই নি। সে পরিবারের একমাত্র সন্তান। এখানে বাধা আরো বেশি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিষয়টি পুরো উলটো হয়েছে। আমার শাশুড়ি একজন শিক্ষিত মহিলা, কিন্ত উনি নিজে চাকুরি করতে পারেন নি, যেজন্য তাঁর একটা আফসোস রয়ে গেছে। সেই আফসোসের জায়গা থেকে তিনি প্রথম দিন থেকেই আমাকে আমার কাজে সাপোর্ট দিয়ে গেছেন। সবটুকু সাপোর্ট আমি উনার কাছ থেকে পেয়েছি। এটা আমার জন্য বড়ো পাওয়া।

আমি বিডিআর ঘটনা কাভার করেছিলাম অনেকটা জোর করে, এবং আমি প্রমাণ করেছি সেটা সম্ভব। হেড অব নিউজ বলেছিলেন, যাওয়ার দরকার নেই। আমি বলেছি আমি যাব। খেটেছি এবং প্রমাণ করেছি। বিএনপি বিট করে আমার এক সহকর্মী, যে রাত ২টার সময় গিয়ে অফিসে বসে ছিল। আমরা প্রমাণ করেছি। এই জায়গায় পৌঁছুতে হবেই। এটা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ।"

—শাহনাজ শারমিন, এবিসি রেডিও

"আমি ফ্যামিলির মতামতের বিরুদ্ধে সাংবাদিকতা বিষয়ে পড়তে আসি। আমার ফ্যামিলি মোটেও এই পেশা পছন্দ করত না। তারপরও আব্বু-আম্মু যেহেতু এই যুগের ছেলে-মেয়েদের মনমানসিকতা বোঝেন, তাই পছন্দ না-করলেও তাঁরা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু শুধু ফ্যামিলি দিয়েই জীবন নয়। ফ্যামিলির বাইরেও আত্নীয়স্বজন আছেন, আব্বুর কলিগরা আছেন। তাঁরা বলেছেন, 'মেয়েকে সাংবাদিকতা পড়াচ্ছো, এই মেয়ের তো বিয়ে হবে না। কারণ সাংবাদিকতায় যারা পড়ে, তারা অনেক বেশি উচ্ছৃঙ্খল হয়, অনেক বেশি ফার্স্ট হয়'। তাদের নাকি বিয়ে হয় না। তারা নাকি খুবই একটা বোহেমিয়ান লাইফ লিড করে। আমার মনে হয়, এটা যারা নারী সাংবাদিক আছেন, তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অপমানজনক। কেন! সাংবাদিক মেয়েরা কি সাংবাদিকতার পাশাপাশি সংসার করছেন না! তাহলে সাংবাদিক মেয়েদের কেন এ অপবাদ দেয়া হচ্ছে যে, সাংবাদিকতায় পড়লে তার বিয়ে হবে না, কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাবে! সাংবাদিকতা কি মেয়েদের কাজ, এটা তো হচ্ছে ছেলেদের কাজ! ছেলেদের মাঝখানে দৌড়াদৌড়ি করা কি মেয়েদের সাজে! এ ধরনের কথাও বলা হয়। আমার মনে হয়, মনমানসিকতার পরিবর্তন বা উদার হওয়ার যে ব্যাপারটি তা প্রথমে পরিবার থেকে আসা উচিত। পরিবার থেকে এলেই আমরা এর প্রতিফলন সমাজে, রাষ্ট্রে দেখতে পাবো, নইলে পাবো না।

মেয়েদের কম গুরুত্বপূর্ণ নিউজগুলো করতে দেওয়া হয়, যেগুলোতে শুধু লিংক যায়, যেগুলো লিড হয় না, কখনো ভয়েস যায় না। এক্ষেত্রে নিজের দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ নেই। একজন মন্ত্রী বা ভিআইপি যা বলবেন তাই কোট করে দেবো, যেখানে আমার দক্ষতা প্রমাণের কোনো সুযোগ নেই। যদি প্যাকেজ করতে দেয়া হয়, তাহলে আমি আমার যোগ্যতাটা দেখাতে পারি। আমি ব্যক্তিগতভাবে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি সেটা হচ্ছে, প্রত্যেক মিডিয়া হাউজে প্রত্যেক সপ্তাহে কিছু স্পেশাল নিউজ হয়ে থাকে। সাধারণত শুক্র ও শনিবারে এই নিউজগুলো অন-এয়ার হয়। কোনো ছেলে যদি স্পেশাল রিপোর্টের আইডিয়া দেয়, তাহলে তাকে কোনো প্রশ্ন না-করেই সেটা বানানোর অনুমতি দিয়ে দেয়া হয়; অথচ একটা মেয়ে যখন কোনো আইডিয়া জমা দেয়, তখন তাকে ডেকে হাজার প্রশ্ন করা হয় যে, আদৌ মেয়েটি সে ব্যাপারে কিছু জানে কি না। তখন বলা হয়, আমার মনে হয় তুমি পারবে না। তোমার এই বিষয়ে আরো বেশি পড়াশোনা করতে হবে বা তোমাকে দিয়ে এ কাজ হবে না। কিংবা রিপোর্ট ভালো হবে না ধারণা করে থামিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে নারীদের কাজ করার মন-মানসিকতা নষ্ট হয়ে যায়।

নারী দিবসের রিপোর্টগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েদের দিয়ে কাভার করানো হয়। এটা কিন্তু ইচ্ছা করলে একজন ছেলেও কাভার করতে পারে। আমি বলব, এখানে একটা সূক্ষ্ম জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন হয়। একটা ছেলে কি নারী দিবস নিয়ে খুব সুন্দর একটা প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে না? অবশ্যই পারে। এছাড়া আরেকটা যেটা হয়, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিন, যেমন পহেলা বৈশাখ কিংবা হালের ক্রেজ ভ্যালেন্টাইনস ডে, এই প্রোগ্রামগুলো কাভার করতে পাঠানো হয় ছেলেদের। কিন্তু কেন? একটা মেয়ে কি এক্ষেত্রে ভালো একটা রিপোর্ট তৈরি করতে পারে না? অবশ্যই পারে। কিন্তু করতে দেয়া হয় না। আমাকে হয়ত এমন একটা নিউজ কাভার করতে পাঠানো হয়েছে, যেটার সেরকম নিউজ ভ্যালুই নেই। ওখানে আমার নিজের যে যোগ্যতা-দক্ষতা সেটা দেখানোর কোনো সুযোগই নেই। নিজেকে প্রমাণ করার আমার কোনো অপশন নেই। কিন্তু একটা ছেলে দেখা যাচ্ছে, ভালো ভালো অ্যাসাইনমেন্ট পাচ্ছে, ভালো ভালো বিট কাভার করছে। ভালো বিট বলতে সেটা পিএম হতে পারে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে পারে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে পারে। লক্ষ করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এইসব বিট যারা কাভার করে তারা প্রত্যেকেই পুরুষ। নারীরা যে একদমই নেই তা নয়, তবে যারা আছে তারা তাদের অধীনে। নারীরা পুরুষদের অনুগত হয়ে কাজ করছে। একটা মেয়েকে কেন টপ লেভেলে পৌঁছানোর সুযোগ করে দেয় না মিডিয়া হাউজ, যেখানে তারা চাইলেই এটা পারে! আমার মনে হয়, মেয়েদের যোগ্যতা আছে আর যোগ্যতা আছে বলেই তারা এই পর্যন্ত আসতে পেরেছে।"

—ফারাহ তানজি, রেডিও টুডে

"সাংবাদিকতা আসলে সকলের পেশা নয়। যারা চ্যালেঞ্জিং কাজ করতে পছন্দ করবে, যাদের মাথায় দিন-রাতের হিসেব থাকবে না, তাদেরই এই পেশা বেছে নেয়া উচিত। এসব শর্তের কারণেই এ পেশায় নারীদের সংখ্যা কম। সকল পেশাতেই হয়রানি আছে। সেটা যৌন হয়রানি বা পেশাগত হয়রানি যেটাই হোক। মেয়েরা প্রতিযোগিতা বা রেষারেষির সম্মুখীন হতে পারে সাংবাদিকতাসহ যেকোনো পেশায়। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে হয়ত ব্যাপারটি বেশি চোখে পড়ে, কারণ তা প্রচার হয় বেশি। পুরুষের মধ্যে দখলদারিত্বের একটি মনোভাব থাকে। তারা নিজের জায়গা ছাড়তে এত অনভ্যস্ত যে কেবল মেয়েদের ক্ষেত্রে নয়, অন্য পুরুষকেও তারা জায়গা ছেড়ে দিতে চায় না। তাদের নিজেদের মধ্যেও এ নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। যখন একটা মেয়ে এ সেক্টরে কাজ করতে আসে, তখন সে অনেক স্পষ্টবাদী হয়, সমস্যাটা নিয়ে কথা বলে, এজন্য আমরা জানতে পারি। আমরা নারী-পুরুষ যেই এ পেশায় আসি না কেন, আমাদের এটা মেনে নিয়েই আসতে হবে যে প্রতিযোগিতায় আমাকে টিকে থাকতে হবে। এজন্য রেষারেষির মতো ব্যাপারে না-জড়িয়ে নিজের যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

সাংবাদিকতা পেশার ধরনটাই এমন যে, নারী বলে অজুহাত দেখানোর কোনো সুযোগ নেই, আবার নারী বলে আমাকে পাশ

কাটানোরও সুযোগ নেই। এখানে কাজ করলে ব্যক্তিত্বটা এত শক্তিশালী হয়ে যায় যে, হয়রানি করার সুযোগ অনেক কম থাকে। তবে মেয়ে হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ে ছোটোখাটো হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাকে। যেমন শুরুতে যখন কাজ করতাম, তখন হয়ত মারামারির রিপোর্ট সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে আমাকে বলা হলো যে, তুমি যেও না। যে মেয়ে পারে তাকে বসরা দিন শেষে কিন্তু আটকান না, কারণ দিন শেষে যা গুরুত্বপূর্ণ তাহলো অন্যান্য চ্যানেলের সাথে প্রতিযোগিতা করে সবচেয়ে ভালো রিপোর্ট হাজির করে কৃতিত্ব দেখানো। আমি আমার কিছু সহকর্মীর ক্ষেত্রে দেখেছি, গর্ভবতী হওয়ার পর তাদের ডেস্কে চলে যেতে হয়েছে। তবে এ ধরনের ঘটনা খুব কম যে, জোরপূর্বক তাদের ডেস্কে পাঠানো হয়েছে। অবশ্য দুয়েকটা এমন ঘটনা ঘটে থাকে, যা খুবই দুঃখজনক।

ছেলেদের মধ্যে সাধারণ কিছু মেল-টার্ম থাকে। অনেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই হোক বা নিজেদের মধ্যে কথা বলার জন্যই হোক চট করে বলে ফেলতে পারে, 'না, ও-তো মেয়ে না'। শারীরিক গঠনের পার্থক্য ছাড়া পেশাগত ক্ষেত্রে যেহেতু খুব বেশি পার্থক্য নেই, তাই সমাজ হয়ত এটা দেখতে চায় না যে, আমি রাতে বাড়ি ফিরছি। আমি আবারো বলব যে, মেয়েদের দায়িত্ব হচ্ছে সমাজের চোখটা তৈরি করা। আমি যেমন নিজে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরি। দেখা গেল যে, রাত সাড়ে বারোটার সময় আমি বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম অফিসের গাড়িতে করে, যেটা হচ্ছে খুবই অস্বাভাবিক আমাদের সমাজে। এ কারণেই এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, আপনার পরিবার এই ব্যাপারটাকে কীভাবে দেখছে। কারণ মূল অভিযোগ বা সমস্যার শুরু হয় পরিবার থেকেই। যখন পরের দিন পাশের বাসার কেউ এসে বলে যে, আপনাদের বউকে তো দেখলাম রাত সাড়ে বারোটার সময় বের হয়ে যেতে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমার শাশুড়ি বিষয়টা কীভাবে নিচ্ছেন। তিনি আমার প্রতি সম্মান রেখে কথা বলছেন কি না, আমার পেশার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ আছে কি না। এই জায়গাটা যদি ঠিক রাখা যায়, তাহলে আমার মনে হয় সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে খুব বেশি সময় লাগবে না। এ ধরনের ঘটনা এখন খুব কম। আমি আমার সহকর্মীদের কাছ থেকেও এরকম কথা শুনি না যে, রাত করে বাড়ি ফেরার ফলে তারা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। যাদের এরকম সমস্যা হয়, তারা আসলে এ পেশায় শেষপর্যন্ত আসেই না বা এলেও একদম শুরুতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যে, এ কাজটা তার জন্য নয়।

আমার ধারণা, পরিবার ও সমাজ যতটা এগিয়েছে, ততটা প্রতিষ্ঠানের মালিকরা এগোন নি। মিডিয়ায় কাজ করার কারণে মেয়েরা অনেক স্পষ্টবাদী হয়। কিন্তু স্পষ্টবাদিতা গুণ মালিকরা পছন্দ করেন না, তা যেকোনো পেশার ক্ষেত্রেই। যেহেতু এখানে পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশি তাই একটা বিকল্প আছে, মেয়েকে প্রমোশন না-দিলেও সে জায়গায়টা খালি থাকে না। উচ্চপদে নারীরা এখনো অনেক কম, তবে অবস্থা ক্রমশ বদলাচ্ছে। যেমন এটিএন নিউজের মুন্নী সাহা, অনন্যার সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, প্রথম আলোর ফিচার সম্পাদক সুমনা শারমীন উচ্চপদে সাফল্যের সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন। এগুলো অনেক ভালো উদাহরণ।"

—ফারজানা রূপা, দেশ টিভি

"আমাদের সমাজ অনেক বেশি পুরুষতান্ত্রিক এবং নারীদের কাজের সুযোগ এ সমাজে অনেক কম। সংগত কারণে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য। সমাজে ধরে নেওয়া হয় যে নারীরা এমন কাজ করবে যেগুলো ঝুঁকিপূর্ণ নয়, চ্যালেঞ্জিং নয়; প্রকৃতপক্ষে যে কাজগুলো কম ঝুঁকিপূর্ণ সেসব জায়গায় তারা কাজ করবে। দেখা যায়, যেসব মেয়েশিক্ষার্থী গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে পাস করে যায় এবং যারা পড়ছে তাদের সবাই সাংবাদিকতায় উৎসাহী হয় না। যদিও এই প্রবণতা বদলে গেছে গত ৫-৭ বছরে। কিন্তু তারপরও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মেয়েশিক্ষার্থীর সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি আছে। কেউ বেছে নিলেও তাদের পরবর্তী সময়ে পেশা বদলের চিন্তা থাকে। তারা হয়ত সাময়িকভাবে এই পেশা বেছে নেয়, কিন্তু এতে স্থায়ী হওয়ার পরিকল্পনা তাদের থাকে না। গোটা সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার নারীর এই ধরনের মাইন্ডসেট তৈরির জন্য দায়ী। পাশাপাশি পুরুষরাও তাদের মনে এই ধারণা গেঁথে দিয়েছে যে, সাংবাদিকতা নারীর জন্য নয়। ফলে নারীর উৎসাহিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এখানে। নারীর যে মনস্তত্ত্ব তৈরি হয় তা কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কয়েক বছর ক্লাস করে হয় না।

যারা এই সমস্যাগুলো বুঝতে পারে, তাদের উচিত নারীদের সেই সুবিধাগুলোয় পৌঁছে দিতে কোন কোন জায়গায় ছাড় দেয়া বা সমান জায়গায় আনা দরকার তা চিহ্নিত করে প্রচেষ্টা চালানো। যেমন মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যাপারটি এক্ষেত্রে আসতে পারে। মাতৃত্বের একটা বড়ো ও প্রধান দায় যেহেতু নারীকেই বহন করতে হয়, সেজন্য আমরা যদি দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে বলে উঠি যে, নারীদের এই কারণে সাংবাদিকতা করা উচিত নয়; তাহলে তা অযৌক্তিক হবে। কিন্তু আমাদের এটা মনে রাখা উচিত যে, বৃহত্তর স্বার্থে প্রজননকর্মভার সামলানোর মধ্য দিয়ে গোটা মানবজাতিকে টিকিয়ে রাখছে এই নারীসমাজ। ফলে কিছুদিন তাদের অনুপস্থিতির কারণে যদি পত্রিকার কিছু ক্ষতি হয় বলে মনে করা হয়, তাহলে বলব যে, তাদের ওই অনুপস্থিতিটা আসলে গোটা মানবজাতিকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই। আমরা যদি এভাবে সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টার মূল্যায়ন করি আবার অন্যদিকে বৃহত্তর পরিসরে কথা বলার চেষ্টা করি, তাহলে সেটা মিলবে না। আমি মনে করি, নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট এই ব্যাপারগুলোকে ঐতিহাসিক ও বৃহত্তর প্রেক্ষিত থেকে দেখা উচিত।

দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতার কারণেই আমাদের মিডিয়াগুলো অনেক ক্ষেত্রে নারীদের নিতে রাজি থাকে না। তাদের পর্যাপ্ত স্বাধীনতা ও সুযোগ দিতে চায় না। এক্ষেত্রে পুরুষদের সংবেদনশীল হওয়া উচিত; সেটা গণমাধ্যমের মালিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে যাঁরা থাকেন তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নারী-পুরুষ মিলেই মানবসমাজ। প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা থাকে। এমন নয় যে পুরুষ বলে সমস্যা কম, নারী সমস্যাবহুল। দুদিক থেকেই কিছু না কিছু সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা থাকে। সমস্যার ধরন ও

প্রবণতাও ভিন্ন থাকে। এসব সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা দূর করতে দু'পক্ষকেই সমভাবে এগিয়ে আসা উচিত।

সমাজের সামগ্রিক মূল্যবোধের যদি পরিবর্তন না-হয় তাহলে বিচ্ছিন্নভাবে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তেমন পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। সমাজের যে মনোভাব তৈরি হয়ে আছে, তা পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রতিনিয়ত সামনে নিয়ে আসা উচিত, এর মধ্য দিয়েই একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। তবে এটা একদিনে সম্ভব নয়, এজন্য লম্বা সময় লাগতে পারে; যেহেতু দীর্ঘদিন আমরা এই মানসিকতার ভিতর দিয়ে এসেছি। আমরা সেই প্রক্রিয়ার ভিতরে আছি কি না, সেটা একটা গুরুত্বপর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল হওয়া খুবই জরুরি।"

—খোরশেদ আলম, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

"বর্তমানে অনেক নারী মিডিয়ায় কাজ করে, কিন্তু এই সংখ্যা দিয়ে আসলে বোঝা যাবে না যে প্রতিষ্ঠানগুলো আসলেই নারীবান্ধব বা নারীর প্রতি সংবেদনশীল কি না। প্রথম আলোর মতো অনেক বড়ো পত্রিকায় আমি দেখেছি যে, খুব বেশি নারী রিপোর্টার ওখানে নেই। এছাড়া সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে তথা এডিটর বা নিউজ এডিটর বা চিফ রিপোর্টার পদে নারী খুবই কম। নারীদের প্রিন্ট মিডিয়াতে খুঁজে পাওয়া যায় না। একইভাবে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়ও সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নেই। প্রতিষ্ঠানগুলোর যাঁরা প্রধান, তাঁদের একটা পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের জন্যই এমনটা ঘটে।

আমি প্রথম আলোর কথা বলছি কারণ তারা দাবি করে যে তারা খুব জেন্ডার সেনসেটিভ, তারা নারীদের নিয়ে কাজ করে। কিন্তু সেখানেই এমন অনেক নারী ছিলেন, যাঁরা কাজ করতে গিয়ে আর টিকতে পারেন নি। তাঁদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি এবং তাঁদের লেখাও আমি আমার বইতে ছেপেছি। তাঁরা যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেটা কিন্তু খুব ইতিবাচক নয়। তাঁরা বলেছেন যে, তাঁদের পুরুষ সহকর্মীরা ঠিকমতো সহযোগিতা করেন না এবং সম্পাদকের দিক থেকেও তারা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পান নি। একজন নারী সহকর্মীকে সম্পাদক বলছেন, 'পুরুষরা তো মোটরসাইকেল চালাতে পারে, আপনি কি পারবেন?' এটা কোনো প্রশ্ন হতে পারে না। তাঁকে দিয়ে দেখলেই দেখা যেত যে, তিনি চালাতে পারেন। আজকাল অনেক মেয়েই মোটরবাইক চালাচ্ছেন। দুই পা দুদিকে দিয়ে মোটরসাইকেলে নারী বসবে, এটা সম্পাদকের ভালো লাগে না। তার মানে সম্পাদকের ভেতরে আসলে একটা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা রয়ে গেছে।

যাঁরা সহকর্মী তাঁরাও অনেক সময় অসহযোগিতা করেন। একজন নারী যদি ভালোভাবে রিপোর্ট বের করে আনতে পারেন তাহলে প্রায়ই একটা কমন কথা বলা হয়, যে, 'ও! তুমি নারী দেখেই নানাভাবে ম্যানেজ করেছো'। আর না-পারলে তো বলাই হয়, 'তুমি তো মেয়ে! তুমি পারবেই না।' অর্থাৎ তাদের নানাভাবে টিজ করা হয়। এক্ষেত্রে কিছু নারীকে দ্বিমুখী চাপে পড়তে হয়। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, নারীকে একটি বিট নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। তাদের কেবল নারী ও শিশু বিট দেয়ার চিন্তা করা হয়। তাদের ভাষায়, এটা সফট বিট। কিন্তু এটা ঠিক নয়। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে অনেক নারী বিভিন্ন শক্ত বিট, যেমন রাজনৈতিক বিট, সংসদ বিট, ক্রাইম বিট প্রভৃতি কাভার করছেন (যদিও কোনো বিটই আসলে নরম বা শক্ত নয়)। সেক্ষেত্রে তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না। মিছিল, মিটিং, মারামারি, ক্রাইম বিট তাঁরা কাভার করছেন এবং বন্যার মধ্যে নিউজ প্রভৃতি আন্তরিকতার সাথে তুলে আনছেন। অর্থাৎ বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিষ্ঠানপ্রধানের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা একটা বড়ো সমস্যা।

কোনো একটা ভালো অ্যাসাইনমেন্ট বা দেশের বাইরে যাওয়ার জন্য অ্যাসাইনমেন্ট প্রধানত পুরুষ সহকর্মীরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়ার চেষ্টা করে। পরে যদি সুযোগ থাকে তখন নারীদের দেয়া হয়। এখন মিডিয়াগুলো এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছুটা বেরিয়ে এসেছে, কারণ এখন নারী সাংবাদিকরা দেশের বাইরে গিয়েও অনেক ভালো রিপোর্ট করছেন। তবে এক্ষেত্রে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। চ্যালেঞ্জ তো থাকবেই, চ্যালেঞ্জটাকে নিতে হবে। এটাকে মোকাবেলা করেই নারীরা এগিয়ে যাবে। আমার মনে হয় না এটি খুব বড়ো সমস্যা, একটা মেয়ে যখন সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নেয়, তখন এতটুকু চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি মোকাবেলা করার মতো মেধা ও যোগ্যতা তার থাকে। সামনে নারী সাংবাদিকরা নিজেদের জন্য একটা শক্ত অবস্থান তৈরি করে নেবে বলে আমার মনে হয়। কোনো মেয়ে যদি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে, বৈষম্যের শিকার হয়, তাহলেও অভিমান করে সরে যাওয়া যাবে না; বরং সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হবে। কারণ তাকে দেখেই অন্যেরা শিখবে। যদি সে সরে আসে, তাহলে ভবিষ্যতে তার ছোটো বোন বা অন্যদের পরিবারের সদস্য ও অন্যরা বলবে, 'ওই মেয়ে তো টিকতে পারে নি, তুমি আবার কেন যাচ্ছ?' তাই কষ্ট করে হলেও সামগ্রিক স্বার্থে তাদের টিকে থাকতে হবে। সামনের সময়টা ভালো করবার জন্য এটা আমাদের দায়িত্ব। তাই ব্যক্তিগত স্বার্থের জায়গাটা সবসময় দেখলে হবে না।"

—রোবায়েত ফেরদৌস, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

"আমি যখন সংবাদে কাজ করি, তখন একটা ঘটনা ছাপা হয়েছিল যে, গাজীপুরে একটা মেয়ে লাঞ্ছিত হয়েছে। কিন্তু জেলা প্রশাসন এ ব্যাপারে কোনো খোঁজখবর নেয় নি। তখন সংবাদে ছাপা হয়েছিল যে, ঘটনার তিনদিন পরও জেলা প্রশাসনের টনক নড়ে নি। পরের দিন শুক্রবার সকালবেলা, সেখানকার ডিসি সংবাদ অফিসে এসে হাজির। তিনি খুব উত্তেজিত ছিলেন এ ধরনের সংবাদ ছাপার কারণে। তিনি বলছিলেন যে, আপনারা টনক নড়ে নি কথাটি কেন লিখলেন? তখন আমার এক সহকর্মী বললেন, তিনদিন কোনো

খোঁজখবর নেন নি, সেটা হচ্ছে টনক না-নড়া, কিন্তু আজকে শুক্রবার জুম্মার নামাজ ফেলে আপনি যে এ সংবাদ ছাপার কারণে একেবারে অফিসে চলে এলেন, এটাই হলো টনক নড়া! অর্থাৎ মিডিয়ায় খবর প্রকাশিত হলে অনেক ঘটনার প্রতিকার হয়। মিডিয়ায় যারা কাজ করছে তারাও যেমন সচেতন হয়, তেমনি প্রশাসনে যারা রয়েছে তারাও মনে করে যে, তাদের একটা জবাবদিহিতার জায়গা আছে এবং সেটা হচ্ছে মিডিয়া। এই জায়গাটাতে মেয়েরা খুব ভালোভাবে বিচরণ করতে পারছে এখন। যেমন মুন্নী সাহা যুদ্ধের খবর কাভার করার জন্য লিবিয়ায় গিয়েছেন। অর্থাৎ এরকম ঝুঁকি নিতেও এখন নারীরা আর দ্বিধা করছেন না। যুদ্ধের মধ্যে বাঙালিদের দুঃখকষ্টের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে মুন্নী সাহার মাধ্যমে। একজন নারী সাংবাদিক যুদ্ধবিধ্বস্ত প্রবাসী বাঙালিদের দুঃখ-কষ্টের চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তবে যেহেতু বিকল্প ব্যবস্থা আছে, তাই নারীর সংখ্যাটা এখনো কম।

আমাদের দেশে একটি সাধারণ চিত্র দেখা যায় যে, কম ঝুঁকি আছে যে পেশাগুলোতে মেয়েরা সে পেশাগুলোতেই বেশি যেতে চায়, এই জায়গাটা বদলাতে হবে। একবার আমরা নারী দিবসে একটা আইটেম করেছিলাম সমকালে, সেখানে দেখা যায় যে কম ঝুঁকির কাজে নারীদের আগ্রহ কেবল আমাদের দেশে নয়, ইউরোপ-আমেরিকাতেও আছে। কম ঝুঁকির কাজ হচ্ছে শিক্ষকতা, চিকিৎসা, নার্সিং। এক্ষেত্রে খুব বেশি চিন্তাভাবনা বা ঝুঁকি থাকে না। চ্যালেঞ্জিং পেশাগুলোকে এড়িয়ে যেতে চাওয়ার একটি কারণ হচ্ছে, তারা হয়ত বাইরের জগতে কম প্রচারণা পেতে চায়। এসএসসি বা এইচএসসির রেজাল্টে দেখা যায়, মেয়েরা অনেক বেশি ভালো করে। কিন্তু পরে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে তারা ঝরে পড়ে বা তাদের সংখ্যা অনেক কমে যায়। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়।

একজন নারী সাংবাদিককে রাতে রিপোর্টিং করতে হবে, তখন শাশুড়ি হয়ত বললেন, 'বউমা চলে এসো'। স্বামী বললেন, 'থাকাটা কি ঠিক হবে?' তখন সে যদি চলে আসে, তাহলে তো তার পক্ষে পরে আর ভালো কোনো রিপোর্টের দায়িত্ব পাওয়া সম্ভব নয়। তাই পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। মেয়েদের সাংবাদিকতায় ভালো করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। এমন কথা বললে চলবে না যে তার সংসার, সন্তান লালনপালন করাই প্রধান কাজ। এছাড়া ঝুঁকি নিতে চায় না বলে ভালো অ্যাসাইনমেন্ট দেব না, এমন কথাও বলা যাবে না। সুযোগ-সুবিধা, যাতায়াত ব্যবস্থা এগুলোতে কোনো সমস্যা আছে কি না তা দেখতে হবে।

এখন নারী সাংবাদিকের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, কিন্তু ৫০-৬০ এর দশকে নারী সাংবাদিক ছিলেনই মাত্র ২-৩ জন। এখন নারী সাংবাদিকরা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে বাইরে যাচ্ছে, মোটরসাইকেল নিয়ে বের হচ্ছে, ক্যামেরা বহন করছে; অর্থাৎ অনেক পরিবর্তন এসেছে। ৭০-৮০ এর দশকে হয়ত নারীরা শুধু নারী পাতাই দেখতেন, কিন্তু এখন বিভিন্ন বিট তারা কভার করছেন। নারী সাংবাদিক সমাজে এখন গুরুত্ব পাচ্ছেন, নারী বলে তার লেখা গুরুত্ব পাচ্ছে না তা নয়। একজন নারীর রিপোর্ট করার ফলে সমাজে তা গুরুত্ব পাচ্ছে, পলিসি মেকারদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে। সাংবাদিকতা পেশা বর্তমানে মর্যাদা ও গুরুত্বের জায়গা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সচেতনতা তৈরি করার কাজটি করে সাংবাদিকেরা। নারী সাংবাদিকদের লেখা প্রকাশ, প্রচার হওয়ার ফলে এখন সমাজের নানা জায়গায় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে নেতিবাচক কিছু হলে সেক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে এবং ইতিবাচক হলে সবার প্রশংসা পাচ্ছে, পজিটিভ ফলো আপ হচ্ছে। সাংবাদিকদের দায়িত্ব নেতিবাচক জিনিসগুলো, অসংগতিগুলো বের করে আনা।

টিজ বা মন্তব্যের ব্যাপারটা মিডিয়ায় আছে। আবার নারী হওয়ার কারণে তারা সহযোগিতা-সহানুভূতিও পাচ্ছে। এ জায়গাটা তুলে না-ধরে সবসময় সমস্যাগুলো তুলে ধরলে কিন্তু অন্যরা এগিয়ে আসবে না। এজন্য সুবিধাগুলোও তুলে ধরতে হবে। যেহেতু নারীর সংখ্যা কম, কাজেই দেখা যায় উপরের লেভেলে গিয়ে আরো ঝাড়াইবাছাই হতে থাকে। কিন্তু সামনে হয়ত এ চিত্র থাকবে না। কারণ নারী সাংবাদিকরা বিভিন্নভাবে এখন তাদের শক্ত অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। বিভিন্ন বাধা আছে, সেগুলোকে জয় করতে হবে।

নারী সাংবাদিক ঝামেলা, যেকোনো সময় যেকোনো জায়গায় যেতে পারে না, এসব অজুহাতকে পাত্তা না-দিয়ে ফ্যামিলিকে ম্যানেজ করে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মেয়েদের এগিয়ে আসতে হবে। নারী ইচ্ছা করে ম্যাটারনিটি লিভ নেয় না, ওটা তার প্রয়োজন। এ কারণে তাকে সাইডলাইনে নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা কোয়ালিটি কাজ দিতে পারে। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। একজন নারী কোয়ালিটি কাজ করছে, তার রিপোর্ট সমাজে আলোড়ন তৈরি করছে, অ্যাকশন হচ্ছে— এরকম অবস্থা তৈরি করতে হবে। যেমন মুন্নী সাহা, মানসুরা হোসাইন, কাকলী প্রধান, গোধূলী প্রমুখ নারী সাংবাদিক তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন।

আমাদের অফিসে ক্রাইমসহ রিপোর্টিংয়ে নারী আছেন ৩ জন, নারী ও ফিচার পাতা মিলিয়ে ৫ জন, মফঃস্বল পাতায় ২ জন এবং কয়েকজন কন্ট্রিবিউটর মিলিয়ে মোট ১০/১৫ জন। সব মিলিয়ে স্টাফ ৪০০ জন, যার মধ্যে সাংবাদিক ২১৩ জন। এক্ষেত্রে আমাদের প্রতিষ্ঠানে একটা বড়ো সমস্যা হলো জায়গাটা অনেক দূরে হয়ে যায়। একটা নারীর পক্ষে এত দূর এসে চাকুরি করা প্রায় অসম্ভব। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে নারীদের সংখ্যা বাড়বে। ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ভালো করতে হবে। অ্যাসাইনমেন্ট দেয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য করা যাবে না। এই সুবিধাগুলো নিশ্চিত করতে পারলে খুব দ্রুত নারী সাংবাদিকের সংখ্যা বাড়বে। কারণ কাজের স্বার্থে নারী সাংবাদিক দরকার, তাই তাদের জন্য সুযোগ সুবিধা তৈরি করতে হবে। অনেক সময় রাতের শিফটে কাজ করতে দেয়া হয় না। ফলে সে তার কাজের প্রমাণ দেখাতে পারে না। তাই তাকে চ্যালেঞ্জটা নিতে হবে। তাকে উপরে উঠতে হলে এই চ্যালেঞ্জগুলো নিতে হবে। রাত তিনটায় বাসায় ফিরতে হলে সেটাই করতে হবে। নারীকেই এগিয়ে আসতে হবে, কোয়ালিটি নিউজ করে দেখাতে হবে। তা না-হলে মনে হবে সে সুবিধা নিতে চাচ্ছে, করুণার পাত্র হতে চাচ্ছে। প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যেতে হবে। চ্যালেঞ্জগুলোতে জয়ী হতে হবে। তাকে পরিবার থেকে এই সুযোগটা করে দিবে হবে।"

—অজয় দাশগুপ্ত, দৈনিক সমকাল

"সাংবাদিকতায় নারীরা আগের তুলনায় বেশি আসছে। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে সংখ্যাটা এখনো অনেক কম। আমি ৭১ সালে মাস্টার্স করে সাংবাদিকতায় ঢুকেছি। তখন সাময়িকপত্রে ছিলাম। তারপর আমি দৈনিক সংবাদে যোগ দেই। তখন নারী সাংবাদিকের সংখ্যা সংবাদে ছিল ৫ জন, আর বিভিন্ন পত্রিকা মিলে ছিল ১২-১৫ জন। তখন আলোচনা ছিল যে সংবাদে অনেক নারী সাংবাদিক কাজ করে। তারপর আস্তে আস্তে অনেক বছর সাংবাদিকতা করার পর সে সংখ্যাটা ১০০-তে এল। সাংবাদিকতায় নিয়োজিত পুরুষ ও নারী সকলে একই কাজ করে, যাতে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু যেহেতু মেয়েরা এখনো সংখ্যায় কম, তাই আমরা এটা আলাদাভাবে দেখছি। মেয়েদের সংখ্যা কম হলে মেয়েদের অবস্থান দুর্বল থাকে। আর সংখ্যাটা বেশি হলে ভালো মূল্যায়ন পায়, কাজের পরিবেশ তৈরি হয়, ভালো সুযোগ তৈরি হয়, মর্যাদা পায়। একটা হলো কোয়ালিটি কাজ, আরেকটা হলো সংখ্যাগতভাবে বেশি উপস্থিতি। এই দুটোই দরকার। আগে এটা ছিল না বলে মনে হচ্ছিল যে আমাদের সুযোগগুলো তৈরি হচ্ছে না। আমরা যারা এ পেশায় ছিলাম, তাদের অনেকেরই মনে হচ্ছিল যে একটা সংগঠন করা দরকার। আমরা তখন বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্র নামে একটা সংগঠন করি ২০০1 সালে। সাংবাদিকতায় নারীদের সংখ্যাগত উপস্থিতি জোরদার করার লক্ষ্য নিয়ে নারী সাংবাদিক কেন্দ্র কাজ শুরু করে। তখন নারী সাংবাদিক ছিল ১০০ জনের মতো। এখন নারী সাংবাদিক কেন্দ্রে ৫০০-এর মতো সদস্য আছে। সব মিলিয়ে সারাদেশে নারী সাংবাদিক ৬০০ জনের মতো হবে। কিন্তু মোট সাংবাদিকের সংখ্যা ৬ হাজারের মতো। মোট ৬ হাজার সাংবাদিকের মধ্যে মাত্র ৬০০ জন নারীর এই সংখ্যাটা অনেক কম। শিক্ষকতা, আইন পেশায় যেমন নারীদের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়, সেই তুলনায় নারী সাংবাদিকের সংখ্যা নগণ্য। যদিও সংখ্যাটা বাড়ছে আস্তে আস্তে।

বর্তমানে কাজের সুযোগ বেড়েছে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বাড়ার কারণে। আবার পত্রিকার সংখ্যাও বর্তমানে অনেক বেড়েছে। আমরা যখন সাংবাদিকতায় আসি, তখন প্রধান ৫টি পত্রিকা ছিল, এর বেশি নয়। পত্রিকার সংখ্যা যে এত বাড়তে পারে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারত না তখন। আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে এখন অনেক পত্রিকা এসেছে। একইভাবে বিটিভি ছাড়া তখন অন্য চ্যানেল ছিল না। এখন অনেক টিভি চ্যানেল এসেছে। পত্রিকায় আগের চেয়ে নিয়োগ সংখ্যা বেড়েছে। আবার চ্যানেলেও অনেক সাংবাদিক নিয়োগ হয়। ফলে দেখা যাচ্ছে যে চাকরির সুযোগ বেড়েছে, তবে অনেক বেড়েছে তা বলা যায় না।

মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোতে যারা কাজ করছেন, তাদের বেশির ভাগই পুরুষ। ফলে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে মেয়েদের দেখা যায় খুব কম। সাংবাদিকতায় তাদের সংখ্যাটা কিছুটা বাড়লেও নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে তারা যেতে পারছেন না। সম্পাদক পদে হাতে গোনা ২/১ জন আছেন। বর্তমানে যুগান্তরের এডিটর একজন নারী, অনন্যার এডিটর তাসমিমা হোসেন; এঁরা মালিক হিসেবে সম্পাদক। অর্থাৎ যাদের সামর্থ্য আছে তাঁরা যেতে পারছেন। কিন্তু যাঁরা যোগ্যতাবলে উচ্চপদে আছেন, তাঁরা হলেন ডেইলি স্টার ম্যাগাজিনের এডিটর আশা মেহরীন আমিন, প্রথম আলোর ফিচার এডিটর সুমন শারমীন আর এটিএন নিউজের মুন্নী সাহা। এছাড়া পত্রিকায় শিফট ইন চার্জ-এর দায়িত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে হয়ত ৫/৬ জন আছেন। প্রথমে আমরা ছিলাম, জনকণ্ঠে আমরা দায়িত্ব পালন করেছি। আমি সংবাদ পত্রিকায় এডিটোরিয়াল বিভাগের প্রধান ছিলাম। এখন আমি চারবেলা চারদিক ও বেঙ্গল বার্তা— এই দুটো মাসিক পত্রিকার এডিটর হিসেবে কাজ করছি। বলতে চাচ্ছি, নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে নারীদের সংখ্যা কম। এ পর্যায়ে নারীদের যেতে হবে, তা না-হলে নারীদের অনুকূল খবর আসবে না, নারীদের সম্পর্কে নিউজের ট্রিটমেন্ট ভালো হবে না, ফোকাস থাকবে না এবং নারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুকূল মনোভাব তৈরি হবে না।

নারী সাংবাদিকদের জন্য আরো বেশি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা, দক্ষতা বাড়ানো প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টির জন্য নারীদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমত নারীকে নিয়োগ দিতে হবে, দ্বিতীয়ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তৃতীয়ত ভালো অ্যাসাইনমেন্ট দিতে হবে যোগ্যতা প্রমাণের জন্য এবং চতুর্থত সঠিক মূল্যায়নের ব্যাপারটা থাকতে হবে। যখন প্রমোশনের প্রশ্ন আসবে, তখন যোগ্যতার ভিত্তিতে সুযোগ করে দিতে হবে। কিন্তু এই জিনিসগুলো এখনো হচ্ছে না। দু'একটা জায়গায় হয়ত হচ্ছে, কিন্তু সেটা ব্যক্তি পর্যায়ে, ব্যাপক ক্ষেত্রে হচ্ছে না।

বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্র থেকে আমরা দাবি জানিয়েছি, সব সংবাদ মাধ্যমে অন্তত ২৫% নারী সাংবাদিক নিয়োগ দিতে হবে। যেখানে বেশি আছে সেখানে কমাতে বলব না। কিন্তু যেখানে কম আছে, সেখানে অন্তত ২৫% নারী সাংবাদিককে সকল বিভাগে নিয়োগ দিতে হবে। এবং অবশ্যই সেটা যোগ্যতার ভিত্তিতে। এছাড়া সঠিক মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার দাবিও করেছি। আরেকটা দাবি করেছি যে, কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ যাতে নারীদের অনুকূলে থাকে, তার জন্য একটা কোড অব কন্ডাক্ট থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বস বা পুরুষ সহকর্মী যেই হোক, সবারই নারী সাংবাদিকদের সাথে সংযত আচরণ করতে হবে। আজেবাজে কথা, খারাপ প্রস্তাব, খারাপ ব্যবহার করা যাবে না, যেটা অনেক প্রতিষ্ঠানে হচ্ছে। মিডিয়ায় যৌন হয়রানি হচ্ছে কমবেশি, সেটা কেউ প্রকাশ করছে কেউ করছে না। যেমন একটি ঘটনা বলা যায়, বাসায় যাওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, কিন্তু সে যায় নি; পরে যখন অন্য সহকর্মীরা ব্যাপারটা শুনল তখন তারা বলল যে, সে এখানে চাকরি করতে পারবে না। তার চাকরি ছেড়ে দেয়াই উচিত। তখন সেই নারীটি চাকরি ছেড়ে দিয়ে নীরবে চলে গেল। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মেয়েটা রাজি না-হলে পেশাগতভাবে তার ক্ষতি করা হয়। আবার অনেক মেয়ে ভালো সুযোগ পাওয়ার আশায় তাদের সহযোগিতাও করছে। এটাও একটা খারাপ দিক। এসবের ফলে একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অন্যরা এ পেশায় আসার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, সব পেশায়ই এ ধরনের

সমস্যা আছে। তাই যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হবে। যোগ্যতা দিয়েই সামনে আসতে হবে, অন্য কোনো উপায়ে নয়। এর মাধ্যমেই নারীরা এগিয়ে যাবে।

আমাদের সংগঠন থেকে আমরা নারী সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেই। রিপোর্ট রাইটিং, জেন্ডার সেনসেটিভ রিপোর্ট রাইটিং, ফিচার রাইটিং প্রভৃতির ওপর হয় প্রশিক্ষণগুলো। সেটা প্রতি মাসে হয় না। মূলত ফান্ডের অভাবে সেটা ৩ মাস বা ৬ মাস পর পর হয়। সরকার বা অন্য কোনো সংস্থার জন্য অপেক্ষা করলে আসলে হবে না।

একবার ঢাকায় ৭ দিন ব্যাপী ট্রেনিং কর্মশালার আয়োজন করেছিলাম। ঢাকার বাইরে থেকেও নারী সাংবাদিকরা এসেছিল ওয়ার্কশপে। এক্ষেত্রে ঢাকার একজন নারী সাংবাদিকের পাশাপাশি প্রত্যন্ত এলাকার একজন নারীও ট্রেনিংয়ের সুযোগটা পেল। তাদের জন্য পর্যাপ্ত ট্রেনিংয়ের সুযোগ নেই। সাব-এডিটরদের জন্যও আমরা ৭ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছিলাম। এছাড়া ফিচার রাইটিংয়ের ওপর ৩ দিন ব্যাপী ট্রেনিংয়ের আয়োজন করেছিলাম। এর মধ্যে ছিল সাংবাদিকতার মৌলিক বিষয়াবলি, সাংবাদিকতার নীতিমালা, স্পোর্টস, ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম প্রভৃতি। এছাড়া ছিল সংবাদপত্রের গদ্যের মান নিয়ে প্রশিক্ষণ। যাতে তাদের যোগ্যতা বাড়ে। আমরা যে জিনিসটি করেছি সেটা হচ্ছে, ট্রেনিং দেয়ার সময় আমরা যে রিসোর্স পারসনদের এনেছি তাঁরা ছিলেন উর্ধ্বতন পর্যায়ের, যাতে ভবিষ্যতে যে নারীরা সাংবাদিকতা করতে চায় বা নিয়োগ পেতে চায়, তাদের সাথে যাতে মিডিয়া কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ বা নেটওয়ার্কিং গড়ে ওঠে। এর মাধ্যমে কেউ কেউ উপকৃত হয়েছে, কেউ কেউ নিয়োগ পেয়েছে। সবাই যে পেয়েছে তা নয়। তবে তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, কাজ শিখেছে। যাতে সবাই এগিয়ে আসে আমরা সেই জায়গা তৈরির চেষ্টা করেছি। এছাড়া আমরা কর্মজীবী নারী, সাংবাদিক হতে ইচ্ছুক ও সাংবাদিকতা থেকে পাস করা মেয়েদের নিয়ে নিয়োগকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছি কয়েকটি। একটা স্টুডেন্টদের সাথে করেছি, আরেকটি করেছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উৎসাহিত ও প্রভাবিত করার জন্য।

আসলে এসব ট্রেনিং প্রতি মাসে করা সম্ভব হয় না ফান্ডের অভাবে। সদস্য সংখ্যা খুব বেশি না-হওয়ার কারণে খুব বেশি ফান্ড জোগাড় করা সম্ভব হয় না। আমরা মূলত বিভিন্ন শুভেচ্ছা সহযোগিতা নিয়ে কাজগুলো করি। এছাড়া সংগঠনটি তার নিয়মিত কার্যক্রম তো চালিয়ে যাচ্ছেই।”

—নাসিমুন হক আরা মিনু, নারী সাংবাদিক কেন্দ্র

“আমি যখন একুশে টিভিতে কাজ করি, তখন নারীরা ছিল শুধু রিপোর্টিংয়ে, জুনিয়র বা সিনিয়র রিপোর্টার এই পর্যন্ত। গত ৭-৮ বছরে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে নারী সাংবাদিক নিউজ এডিটর, চিফ রিপোর্টার, এসিস্টেন্ট নিউজ এডিটর হয়েছে। তাই সংখ্যার দিক থেকে কম হলেও নারী সাংবাদিকদের অবস্থান ও উপস্থিতি বর্তমানে শক্তিশালী ও দৃশ্যমান। এটার একটা ইতিবাচক দিক হলো যে, আরো অনেক মেয়ে এই পেশার প্রতি আগ্রহী হবে। তারা ভাববে যে, এই পেশায় গেলে ক্যারিয়ারের দিক থেকেও ভালো অবস্থান তৈরি হবে এবং পরিবেশটা ভালো পাবো। তা না-হলে অন্য নারী সাংবাদিকরা কীভাবে এত দ্রুত প্রমোশন পেয়ে এই জায়গায় গেলেন? কাজেই সবদিক দিয়েই বিষয়টা খুব ইতিবাচক। আমি মনে করি না যে, এর মধ্যে হতাশার কিছু আছে। পরিবেশও বর্তমানে অনেক উন্নত।

একুশে টিভি থেকে যখন প্রথম নারী সাংবাদিককে বাইরে পাঠানো হয়, তখন আমাদের অভিজ্ঞতা ছিল খুব নেতিবাচক। কারণ মেয়েটা যেতে চায়, কিন্তু তার সাথে একজন পুরুষ ড্রাইভার ও ক্যামেরাম্যান যাবে বলে তার পরিবার থেকে এ নিয়ে দোদুল্যমানতা ছিল। আমরা যারা অ্যাসাইনমেন্ট দেয়ার দায়িত্বে ছিলাম, আমাদের মধ্যেও দোদুল্যমানতা ছিল। অনেক ধরনের বিষয় এক্ষেত্রে কাজ করেছে। কিন্ত বর্তমানে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। পরবর্তী সময়ে মেয়েটাও এই বিষয়টাকে ওভারকাম করেছে এবং আমাদের মধ্যে যে অস্বস্তিবোধ ছিল তা চলে গেছে। এখন একজন নারীকে এতকিছু ভাবতে হয় না, সে এখন সহজেই পুরুষ রিপোর্টার বা সহকর্মীর সাথে চলে যেতে পারছে অ্যাসাইনমেন্ট কাভার করতে। অর্থাৎ মেয়েদের মানসিকতা এবং পুরুষ সহকর্মী বা মূল দায়িত্বে যারা আছেন তাদের মানসিকতারও পরিবর্তন হয়েছে। নারী সাংবাদিকদের পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তিত হয়েছে। এ কারণে নারী সাংবাদিকদের সংখ্যা এখন অনেক বাড়ছে।

নারীর পেশা নিয়ে গোটা সমাজের মধ্যেই কূপমণ্ডুকতা রয়ে গেছে। শুধু নারীর বিষয়ে নয় অনেক বিষয়ে রয়েছে। এই কূপমণ্ডুকতা থেকে বেরিয়ে আসাই প্রগতিশীলতার কাজ। যখন একটা মেয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, তখন অন্য মেয়েরা আগ্রহী হয়ে ওঠে। বর্তমানে নারীরা সেনাবাহিনী, পুলিশ-আনসার বাহিনী প্রভৃতিতে যোগদান করছে এবং সফলতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। কিন্তু এক সময় মনে করা হতো, এগুলো কেবলই পুরুষের পেশা। নারীদের পেশা হচ্ছে ডাক্তারি, ব্যাংকের চাকরি। বর্তমানে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। একইভাবে মেয়েদের সাংবাদিকতা পেশা বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে বর্তমানে পরিবারগুলোর মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে। প্রথম সমর্থন পরিবার থেকেই আসে, তাই পরিবার সমর্থন দিলে সমাজ বিরুদ্ধে গেলেও নারীর পক্ষে এই পেশায় আসা সহজ হয়। কিন্তু সমর্থন না-দিলে পরিবার ও সমাজের বিরুদ্ধে যেতে হয়। তাই অনেকগুলো পরিবার এক সাথে হয়ে এগিয়ে এলে সমাজের এই পশ্চাৎপদতা দূর করা সম্ভব। মেয়েটিকে সমর্থন দেয়ার ক্ষেত্রে মূল দায়িত্বটা পরিবারের। এক্ষেত্রে আমি একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমি যখন একুশে টিভিতে ছিলাম তখন রাতের শিফটে একটা মেয়ে কাজ করত। মেয়েটি রাতের শিফটে কাজ করতে চায় কিন্তু তার বাবা তাকে রাতের শিফটে কাজ করার অনুমতি দিলেন না। তিনি এক শর্তে রাজি হলেন যে, আমি যদি

মেয়েটিকে বাসায় পৌঁছে দেই তাহলে তিনি অনুমতি দেবেন। আমি তখন একুশের বার্তা বিভাগের প্রধান। আমি ওই দায়িত্ব নেয়ার পর তখন তার বাবা তাকে কাজ করার অনুমতি দিল। তাই একজন মেয়ের ক্ষেত্রে পরিবারের সমর্থন সবচেয়ে বেশি দরকারি। পরিবারের সমর্থন থাকলেই তারা সমাজে তাদের জায়গাটা করে নিতে পারে।

উন্নত বিশ্বের সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, আমাদের দেশ অনেক ভালো অবস্থানে আছে। বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে যদি ১ ঘণ্টা কারেন্ট না-থাকে তাহলে হাজার হাজার নারী ধর্ষণের শিকার হয়। সেটা হয় তাদের কালচারের কারণে। আমাদের এখানে ৯-৫টা পর্যন্ত অফিস করে মেয়েটি বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু সেখানে অফিস টাইম শেষ হওয়ার পর বসের সঙ্গে পার্টিতে যেতে হয়। ফলে এটা করার কিছু সুযোগ তাদের এমনিতেই থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে কোনো বস যদি কোনো নারীকে নির্যাতন করতে চান, তাহলে তাঁকে অ্যাপ্রোচ করতে হয় নারীর সামনে। এটা আমাদের সংস্কৃতিতে বেমানান। তাই এটা যখন বলে তখন বোঝা যায় যে, কোনো অসৎ উদ্দেশ্য আছে। কাজেই ব্যাপকভাবে করা সম্ভব হয় না, তবে একেবারেই যে হয় না তা নয়। যৌন হয়রানি বা জেন্ডারকেন্দ্রিক হয়রানি হয়ত আছে, কিন্তু আমি যে ব্যাপারটি লক্ষ করেছি সেটা হচ্ছে, মেয়েটাকে খাটো করে দেখানোর প্রবণতাটা আছে। এড়িয়ে যাওয়া, মেইন পলিসি লেভেলের মধ্যে তাকে না-নিয়ে আসা, এমন ভাষা ব্যবহার করা যাতে মেয়েটা অসম্মানিত বোধ করে, এই ব্যাপারগুলো আমাদের সংস্কৃতির সমস্যা।

নারী যখন পুরুষ সহকর্মীর সাথে কাজ করে, তখন তার সাথে কীভাবে ব্যবহার করা উচিত, সেটা কিন্তু মানুষ পরিবার থেকেই শিখে থাকে। এক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিলে বুঝতে হবে ফ্যামিলি থেকে হয়ত সে শিক্ষাটা পায় নি। সেটা দূর করা যেতে পারে প্রতিনিয়ত সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে। মেয়েদের এই চ্যালেঞ্জটাকে মোকাবেলা করতে হবে বা শক্ত অবস্থান নিতে হবে।

প্রযুক্তির উন্নতির কারণে এ ধরনের হয়রানি করা সহজ হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র একজন লোক একবার আমার এক মহিলা কলিগকে মোবাইলে আজেবাজে এসএমএস করেন। এতে মেয়েটি হতবাক হয়ে যায় এবং অনেক কান্নাকাটি করে। পরবর্তী সময়ে সে আমাকে এসে ব্যাপারটি বললে আমি মিটিংয়ে ব্যাপারটি নিয়ে কথা বলি। উত্যক্তকারীর নাম উল্লেখ না-করে আমি মিটিংয়ে বলি যে, এখানে আমরা নারী-পুরুষ সহকারী সবাই এক সাথে কাজ করি। কিন্তু কারো আচরণের কারণে যদি কোনো সহকর্মী অপদস্থ হয়, চাকরি ছেড়ে চলে যায়, তাহলে সেটা হবে খুব দুঃখজনক। পরবর্তী সময়ে সিনিয়র লোকটা সেই নারী সহকর্মীর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হন। তারপর আর এ ধরনের ঘটনা ঘটে নি। পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় মেয়েদের এ ব্যাপারগুলো নিয়ে মুখ খুলতে হয়। অর্থাৎ মেয়েদেরও এক ধরনের পুরুষালি আচরণ শিখতে হয় প্রতিবাদ করার জন্য। একজন নারীর প্রতি এ ধরনের আচরণ করা হলে, তখন যদি সে অন্য নারী সহকর্মীদের সাথে এ নিয়ে কথা বলে, তখন সবাই একত্রিত হয়ে এর প্রতিকারে এগিয়ে আসতে পারে।

কোনো একটি টিভি চ্যানেলের উপরের সারির একজন বস এক নারী নিউজ প্রেজেন্টারের কাছে গিয়ে অ্যাপ্রোচ করলেন। তখন মেয়েটি সরাসরি তাঁর সাথে গিয়ে এ ব্যাপারে কথা বললে তিনি মেয়েটিকে উত্যক্ত করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

পুরুষ সহকর্মীদের আচরণ উন্নত হওয়া উচিত। নারী সহকর্মীকে অন্যভাবে না-দেখে বোনের মতো, সহকর্মীর মতোই দেখা উচিত। সবাইকেই আচরণের সীমারেখা সম্পর্কে জানতে হবে। কার সাথে কার আচরণ কেমন হবে তা ছেলে-মেয়ে দুজনকেই বুঝতে হবে। এক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কৃতি আচরণ পরিবর্তনে ও আচরণ কীভাবে করতে হয় তা জানার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। যদি বস মনে করেন যে, তাঁর প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে বলে তিনি যা বলবেন তাই করতে হবে, এটা কোনো সুস্থ মানসিকতার পরিচয় হতে পারে না। মিডিয়াতে কমবেশি যৌন হয়রানি আছে। এক্ষেত্রে সমাধান হলো পুরুষদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে মেয়েদের একটা অবস্থান নিয়ে দাঁড়ানো। প্রথমে নিজে বোঝা, তারপর অন্য নারী সহকর্মীদের সাথে সমস্যা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান বের হয়ে আসবে। অর্থাৎ তাকে প্রতিবাদী হতে হবে সমস্যা সমাধানের জন্য।

মুন্নী সাহা, কিশোয়ার লায়লা, শাহনাজ মুন্নী এরা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে। বাংলাদেশের বড়ো বড়ো পলিটিক্যাল বিটগুলোতেও এখন নারী সাংবাদিকদের অবস্থান। মুন্নী সাহা লিবিয়ায় যুদ্ধের রিপোর্ট কাভার করে এসেছে। প্রিন্ট মিডিয়াতে রোজিনা সংসদের মতো শক্ত বিট করছে। কাজেই অনেক নারী সাংবাদিকই এখন অনেক শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন। এর ফলে অন্য মেয়েদের জন্য জায়গা তৈরি হচ্ছে। কাজেই নারী মানেই দুর্বল এই চিন্তা এখন বাদ দিতে হবে। যারা একটু শক্ত অবস্থান নিয়ে আসতে পারবে, পরিবার থেকে সমর্থন পাবে, তারা এই ক্ষেত্রে অবশ্যই শক্ত অবস্থান তৈরি করতে পারবে। কিশোয়ার লায়লা বর্তমানে চিফ রিপোর্টার। তার আন্ডারে অনেক পুরুষ সাংবাদিক কাজ করছে। তার কথা পুরুষদের শুনতে হচ্ছে। ফলে পরিবর্তন আসছে। মেয়েরা এমপাওয়ারড হচ্ছে। অ্যাসাইনমেন্ট দেয়ার ক্ষেত্রে মেয়েদের বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে, এ ধারণা বর্তমানে ঠিক নয়। নারীদের ডেস্কে কাজ করাই ভালো এই ধরনের মনোভাবও এখন নেই। যারা দায়িত্ব নিতে চায় এবং যারা দায়িত্ব দিতে চায় উভয়ের মানসিকতাই বদলাচ্ছে। ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে মেয়েকে বাছাই করা হলে অনেক সময় কিছু কিছু প্র্যাকটিক্যাল কারণে নেয়া হয় না। এটা আসলে আমাদের সিস্টেমেরই সমস্যা। তবে এখন ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ এই ধরনের বৈষম্য করা হয় না। এগুলো বড়ো বাধা নয়।

কর্মস্থলে ডে-কেয়ার সিস্টেম নেই, টয়লেটের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। কাজের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা থাকে, যা নারীদের এই পেশায় আসতে নিরুৎসাহিত করে। অনেক সময় এই সমস্যাগুলি অনেক বড়ো হয়ে দেখা দেয়। এছাড়া ট্রান্সপোর্টের সমস্যাও বড়ো সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। রাতের বেলা বাড়ি ফেরার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ইনডিপেনডেন্ট-এ একজন সাংবাদিক কাজ করত। কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে এফডিসির সামনে দিয়ে তাকে যেতে হতো। তখন আশেপাশের লোকজন বিভিন্ন ধরনের

মন্তব্য করত। এই কষ্টে সে চাকরিই ছেড়ে দেয়। তাই অনেক ধরনের ছোটোখাটো সমস্যা আছে, যেটা শুধু মিডিয়া হাউজের সমস্যা নয়, আমাদের সমাজ, সমাজের নিয়ন্ত্রক তাঁদেরও এ ব্যাপারে কাজ করার আছে।”

—মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, বৈশাখী টিভি